ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪৩, ১৪৩২/২০২৫, ২৫-৪০
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4302

মওলানা জালালুদ্দিন রূমীর কাব্যে তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক প্রেমের অনুসন্ধান

ড. মো. আতাউল্যাহ
অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: Maulana Jalaluddin Rumi (1207–1273 CE) is a unique creator in Persian literature. The central inspiration and core of his work is love. In Rumi's view, love is not merely a human emotion or a romantic feeling; rather, it is the fundamental creative force of the universe and the primary means of humanity's spiritual elevation. Rumi's philosophy of love is deeply intertwined with his Sufi worldview. In his works, love takes the form of *ishq-e haqiqi* (divine love), which frees a person from worldly attachments and leads them toward union with the Absolute. According to Rumi, through love one can transcend the limits of the ego and reach closeness to universal truth. This love awakens the unconscious within human beings and, through spiritual practice, creates the possibility of realizing ultimate truth. Love functioned simultaneously as a driving force and a liberating power. It became established as a universal philosophy for the ethical and spiritual upliftment of human life, continuing to illuminate human thought throughout the ages. This article attempts to explore theoretical and spiritual love in the poetry of Maulana Jalaluddin Rumi.

Key Words: Maulana Jalaluddin Rumi, Persian Poetry, Theoretical Love, Spiritual Love, Sufism, Divine Love, (ʿIshq).

ভূমিকা

ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে মওলানা জালালুদ্দিন রূমী এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত একজন সুফি কবি ও দার্শনিক। তাঁর কাব্য শুধু সাহিত্যিক সৌন্দর্যের জন্য নয়; বরং গভীর তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের জন্য বিশ্বসাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। রূমীর কাব্যের মূল সুর ও কেন্দ্রীয় ভাব হলো প্রেম। যা তাঁর দৃষ্টিতে মানবিক আবেগের সীমা অতিক্রম করে পরম সত্য উপলব্ধির এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। এই প্রেম মানুষকে আত্মপরিচয়ের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে ঈশ্বরানুভূতির পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করে। রূমীর প্রেমভাবনা সুফি দর্শনের আলোকে গড়ে উঠেছে। যেখানে এশক কেবল অনুভূতিই নয়; বরং আত্মশুদ্ধি ও আত্মউন্নয়নের একটি কার্যকর সাধন পদ্ধতি। তাঁর কাব্যে মানবিক প্রেম ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে আত্মা

ও পরম সত্তার মিলনের পথ প্রশস্ত করে। রূমীর মতে প্রেম ছাড়া আত্মজ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং প্রেমই মানুষকে অস্তিত্বের গভীর সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে। বিশেষত *মাসনাভি-এ মা'নভি*সহ তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে প্রেমের এই তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক রূপ নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রেমের দার্শনিক তাৎপর্য, আত্মিক পরিশুদ্ধির ভূমিকা এবং মানব-ঐশী সম্পর্কের নিরিখে রূমীর প্রেম দর্শনের স্বরূপ অন্বেষণই এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে মওলানা জালালুদ্দিন রূমীর কাব্যে তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক প্রেমের অনুসন্ধান সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

জালালুদ্দিন রূমীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

ফারসি সাহিত্যের খ্যাতিমান সুফি কবি মওলানা জালালুদ্দিন রূমী ১২০৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ মে খোরাসানের বালখ শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ ওয়ালাদ এবং মাতার নাম মোমেনা খাতুন। বংশগতভাবে পিতার দিক থেকে তিনি ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ও মাতার দিক থেকে ছিলেন হযরত আলি (রা.) এর সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং পিতা ও মাতা উভয় দিক থেকেই রূমী ছিলেন অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।[২] মওলানা রূমী তাঁর মাসনাভির জন্য ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত। যাকে পাহলভি ভাষার কুরআন বলা হয়ে থাকে। যেমন এ প্রসঙ্গে ফারসি কবি আব্দুর রহমান জামি (১৪১৪-১৪৯২ খ্রি.) বলেন,

مثنوی مولوی معنوی هست قرآن در زبان پهلوی[৩]

'তাৎপর্যপূর্ণ মওলানা রূমীর মাসনাভি, যেন পাহলভি ভাষার কুরআন।'

মওলানা জালালুদ্দিন রূমী ছিলেন মূলত একজন আধ্যাত্মিক কবি। তাঁর কাব্যে নীতিনৈতিকতা, প্রেম-ভালোবাসা, সুফিবাদ ও অধ্যাত্মবাদসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধৃত হয়েছে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে তাঁর রচিত মাসনাভি বিশ্ব কাব্যসাহিত্যে এক বিপ্লব সাধন করে। তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হলো প্রেম।[৪] প্রেম দুই ধরনের হতে পারে। আধ্যাত্মিক প্রেম যা স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত ও জাগতিক প্রেম যা সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। আধ্যাত্মিক প্রেমের মূল উৎস হচ্ছে স্রষ্টা।[৫] নিতান্তই নির্জনে বসে ধ্যানে মগ্ন থাকার মাধ্যমে মানুষের আত্মার সাথে খোদার সম্পর্ক তৈরি করাই ছিল রূমীর ঐশী প্রেমের মূল উদ্দেশ্য। রূমীর মাধ্যমে ফারসি সুফি কাব্য সর্বোচ্চস্তরে উপনীত হয়।[৬] তিনি সুফিবাদী চিন্তা-দর্শনের পথ পরিক্রমাসমূহ প্রেমের আবেগ-অনুভূতির মাধ্যমে প্রকাশ করেন।[৭] মওলানা রূমীর কাব্য থেকে আধ্যাত্মিক প্রেম সংক্রান্ত কিছু কবিতা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

بشنو از نی چون حکایت می کند وز جدائیها شکایت می کند[৮]

'কান পেতে কোনো বাঁশি কী অবস্থা বর্ণনা করিতেছে, বিরহ বিচ্ছেদের কী অভিযোগ বর্ণনা করিতেছে।'

আলোচ্য মাসনাভিতে কবি মানুষের আত্মা রুহের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে যে প্রেম-বিরহের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে সে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির অনেক পূর্বে রুহ সৃষ্টি করে তাদেরকে আলমে আরওয়াহ তথা রুহের জগতে রেখে

দিয়েছেন। ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকভাবে মানুষের মাঝে রুহ বা আত্মা দিয়ে একেক করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। দীর্ঘকাল রুহ যখন তার সঙ্গীদের সাথে একত্রে বসবাস করে মহান প্রভুর ইচ্ছায় তাদের ছেড়ে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে, তখন তাদের রুহের ওই জগৎ থেকে সাথিদের ছেড়ে পৃথিবীতে আসতে অনেক কষ্ট হয়েছে। দীর্ঘকাল যদি কেউ কারো সাথে একত্রে দিনাতিপাত করেন তবে তাদের মাঝে একটি হৃদ্যতা, ভালোবাসা ও গভীর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। আর সেই সম্পর্কের শেকড় থাকে অনেক গভীরে। তাই সেখান থেকে যখন কাউকে আলাদা করে দেওয়া হয়, তখন তাদের সম্পর্কের যে শেকড় তা দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে যায়। আর এ শেকড় ছেঁড়ার যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খায় প্রতিনিয়ত। বুকের ভেতরে সর্বদা প্রবাহিত হয় বিরহ-বিচ্ছেদের রক্ত। বিরহ এবং আপনজন থেকে বিচ্ছেদের এ যন্ত্রণা তার ভিতরটা ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। নিজের অজান্তেই দেহকে লুকিয়ে আত্মা তার ছেড়ে আসা প্রিয়জনকে খুঁজে প্রতিনিয়ত। কী যেন এক শূন্যতা তাড়া করে বেড়ায় তাকে সবসময়। শত চেষ্টা করেও হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের সাথে একত্রে থাকার সেই সুখ আর সে খুঁজে পায় না। তাই দেহের অজান্তেই তার আত্মা সবসময় কাঁদে। এইযে ক্রন্দন এটা মূলত প্রিয়জন থেকে বিচ্ছেদের ক্রন্দন। শেকড় ছিঁড়ে বুকের গহিনে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে সে কষ্টের ক্রন্দন। আত্মার এই ক্রন্দনকেই মূলত কবি এখানে বাঁশির সুরের সাথে তুলনা করেছেন। বলেছেন হে মানুষ, তুমি খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে শোনো তোমার আত্মা কী বলতেছে, তবেই তুমি বুঝতে পারবে সে তার রুহের জগতে রেখে আসা প্রিয়জনের বিরহ-বেদনায় আর্তনাদ করতেছে। উপরোক্ত কবিতায় বিরহের এই কথাগুলোই অত্যন্ত চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন কবি রূমী।

এ প্রসঙ্গে কবি আরও বলেন–

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش[৯]

'যে ব্যক্তি আপন অবস্থান হতে দূরে অপসারিত হয়েছে, সে পুনরায় তাঁর মিলনযুগ অন্বেষণ করেছে।'

খোদাপ্রেম সম্পর্কে বলেন–

جمله معشوق ست و عاشق پرده زنده معشوق ست و عاشق مرده.[১০]

'জগতের সবকিছুই প্রেমাস্পদ আর সমস্ত প্রেমিক তার আবরণ,
প্রেমাস্পদ জীবিত আর প্রেমিক মৃত।'

মওলানা জালালুদ্দিন রূমীর মৃত্যুর খুব কাছাকাছি সময়ে কৌনিয়ায় একাধারে ৪০ দিন পর্যন্ত ভূমিকম্প সংঘটিত হতে থাকে। এ সময় রূমী টানা সাতদিন অসুস্থ হয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে ছিলেন। এভাবে অবিরত ভূমিকম্প হতে থাকলে ওই এলাকার লোকজন খুবই ভীতসন্ত্রস্ত এবং বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েন। এমন অসহায় অবস্থায় তারা রূমীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আর রূমী তাদের উদ্দেশ্য করে বলতেন, "জমিনের ক্ষুধা লেগেছে, সে এখন খাদ্য চায়, শীঘ্রই তা পেয়ে যাবে এবং ভূমিকম্পনও বন্ধ হবে।"[১১] এর কিছুদিন পর রূমী আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসকগণ তাঁর রোগ নির্ণয়ে ব্যর্থ হন। ঠিক এমনই একটি দুর্বিষহ সময়ে বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার, হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত ফকিহ, সুফি, দার্শনিক তথা ফারসি সাহিত্যের এই অমর

কবি ১৭ ডিসেম্বর ১২৭৩ খ্রিষ্টাব্দে কৌনিয়াতেই মৃত্যুবরণ করেন।[১২] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর, কৌনিয়ার বিশিষ্ট আলেমে দীন মওলানা ছদরুদ্দীন কৌনবী[১৩] তাঁর জানাজার নামাজে ইমামতি করেন।[১৪]

রূমীর কাব্যে তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক প্রেমের অনুসন্ধান

মওলানা জালালুদ্দিন রূমী যদিও একজন আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন, সর্বদা তিনি খোদাপ্রেমে মগ্ন থাকতেন এবং আধ্যাত্মিকতা নিয়েই অধিকাংশ কবিতা রচনা করেছেন। তারপরও তাঁর কাব্যে জাগতিক প্রেম এবং রোমান্টিকতা সম্পর্কিত কিছু কবিতাও পরিলক্ষিত হয় যা তাঁর কাব্য প্রতিভারই প্রমাণ বহন করে। যেমন কবি বলেন–

مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.[১৫]

'আমি মৃত ছিলাম জীবিত হলাম কাঁদতে ছিলাম সহাস্য হলাম, প্রেমের মহা সম্পদ এলো তাইতো চির রত্ন হলাম।'

মওলানা জালালুদ্দিন রূমী জীবনের রহস্য খুঁজতে গিয়ে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ অবসাদগ্রস্তের এক পর্যায় তিনি তাঁর মুর্শিদ শামস তাবরিজির[১৬] মাধ্যমে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অবগত হন এবং তাঁদের মাঝে চমৎকার এক আত্মিক তথা প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যার মাধ্যমে তিনি তাঁর সকল দুশ্চিন্তা, হতাশা, নিরাশাকে বিদূরিত করে নতুন এক জীবনের সন্ধান লাভ করেন। মূলত এ প্রেমজ্ঞানই তাঁকে পরবর্তীতে এত উঁচু মানের একজন সাধক, প্রেমিক ও রোমান্টিক মানুষ হিসেবে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সহযোগিতা করে। তাইতো তিনি চরম আনন্দ নিয়ে বলেন, প্রেম ও ভালোবাসাহীন এ জীবনে আমি যেন এক জীবন্ত লাশ হয়ে পড়েছিলাম, শুধু আমার ভেতরের এ আত্মাটা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে জীবিত ছিল। কিন্তু একজন জীবন্ত মানুষ যে কখনো কর্মহীন নিস্তেজ থাকতে পারে না, কর্মহীন নিস্তেজ মানুষ মানে যে লাশের সমতুল্য, তা যখন তিনি তাঁর মুর্শিদের প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চলমান হলেন তখনই এটা তাঁর অনুভূতিতে জাগ্রত হয়। রূমী প্রেমহীন এই জীবনে সর্বক্ষণ কান্নারত ছিলেন। এ প্রেমই তাঁর ক্রন্দনময় জীবনকে উৎফুল্লতার ছোঁয়ায় পরিপূর্ণ করে দেন। ফিরে পান তিনি এক নতুন জীবন। প্রেমহীন মানুষ শুকনো মরুভূমির মতো। মরুভূমির মাটিতে যেমনি হাজারো পলি বিদ্যমান থাকার পরও শুধুও পানি না থাকার কারণে ফসল জন্মায় না, ঠিক তেমনি অনেক যোগ্যতা থাকার পরও একজন মানুষের ভেতরে যদি প্রেমের অনুভূতি না থাকে তবে সে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না এবং নিজের যোগ্যতারও বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয় না। তাই নিজেকে একজন সফল ও যোগ্য মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অবশ্যই তার মাঝে প্রেম, ভালোবাসা, রোমান্টিকতা ও দর্শনের ছোঁয়া থাকা আবশ্যক। তাইতো কবি যথার্থই বলেছেন প্রেমের মতো মহান সম্পদ যখন জীবন নামের এই ভেলায় এসে ধরা দিয়েছে তখনই নিজেকে রত্ন মনে হয়েছে। তাই প্রত্যেকটা মানুষের উচিত, জাগতিক এই জীবনকে সুন্দর ও সফল করে সাজাতে এবং মানুষ ও মানবতার কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আত্মিক প্রশান্তি পেতে প্রেমের মতো এমন পবিত্র জিনিস জীবনে ধারণ করা এবং জীবন্ত লাশ হয়ে বেঁচে না থেকে চলমান মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা নিরাশা, হতাশা

জীবনে স্থান না দিয়ে উৎফুল্ল থাকা এবং নিজেকে সমাজের বোঝা হিসেবে না রেখে সমাজের সম্পদ তথা রত্নে পরিণত করা। আর একথাগুলোই অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেছেন কবি রূমী তাঁর কাব্যে। রূমী জীবনের অধিকাংশ সময়ই বিরহ বেদনার বিষয়াদি নিয়েই কবিতা রচনা করেছেন। যেমন কবি বলেন–

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق.[১৭]

'বিরহ বেদনায় যাদের বক্ষ বিদীর্ণ, আমার প্রেম বেদনা প্রকাশের জন্য, এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ বক্ষেরই প্রয়োজন।'

ব্যথিতদের দর্শনে এবং আর্তনাদকারীদের বুকফাটা কান্না শুনে যদিও অনেক মানুষ ব্যথিত ও মর্মাহত হয়, তবে কিছু মানুষ এমনও রয়েছে, যাদের কঠিন হৃদয় এ করুণ আর্তনাদ শুনেও বিগলিত হয় না; বরং ব্যথিত সুজনকে তারা ধোঁকাবাজ, লোকদেখানো এবং কপট মনে করে। আর এ ধরনের কথা মূলত ওই সমস্ত মানুষই বলে থাকেন, যারা কখনো বিরহের যন্ত্রণায় ভুক্তভোগী নয় এবং এমন কঠিন কষ্টের স্বাদ কখনো ভোগ করেনি। যাকে কখনো সাপ দংশন করেনি সে কখনো সাপের ব্যথার কী যন্ত্রণা তা অনুভব করতে পারবে না। যেমন কবি কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার[১৮]-এর ভাষায় 'চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন, ব্যথিতবেদন বুঝিতে পারে। কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।' একজন মানুষ তখনই বিরহের ব্যাথা বা বিরহের জ্বালা অনুভব করতে পারবে যখন সে বিরহ নামক এ কঠিন অনলে দগ্ধ হয়েছে। এছাড়া যদি সাধারণ কোনো মানুষের সামনে বিরহের অনলে দগ্ধ কোনো ব্যক্তি যন্ত্রণায় কাতরায় তবে সে এ কাতরানোকে রিয়াহ বা লোকদেখানোই মনে করবে। এজন্যই কবি বলেছেন, প্রেমের বিরহে যাদের বক্ষ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, কষ্টে যাদের হৃদয় বিদীর্ণ আমার এই বিরহব্যথা অনুভব করার জন্য এমন লোকই প্রয়োজন। এ ধরনের মানুষ ব্যতীত আমার বিরহী মনের ব্যথা অন্য কেউ অনুভব করতে পারবে না। একথাগুলোকেই অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন কবি রূমী। যা কাব্যপিপাসু মানুষ খুব হৃদয়গ্রাহীভাবে তা গ্রহণ করেছে। কবি অন্যত্র বলেন–

آتش عشق ست کاندر نی فتاد جوشش عشق ست کاندر می فتاد.[১৯]

'এশকেরই আগুন যা বাঁশিতে প্রজ্বলিত হইতেছে,
(ইহা) এশকেরই মত্ততা যাহা শরাবে উৎপন্ন হইতেছে।'

এশক বা প্রেম নিজেই একটা দহন, যে নিজে জ্বলে এবং অপরকেও জ্বালায়। প্রেমের বিরহ-বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় প্রেমিক যখন কাতরাতে থাকে, তখন এর দহন তার সমস্ত শরীর থেকে প্রবাহিত হতে থাকে। মানুষ যখন কারো প্রতি গভীর প্রেমে হাবুডুবু খায়, জীবনে মরণে শুধু তাকে নিয়েই চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন সে তার দুই চোখে এই পৃথিবীতে তার প্রেমাস্পদ ব্যতীত আর কোনোকিছুই দেখতে পায় না। যে দিকে তাকায় শুধু তার প্রেমাস্পদকেই দেখতে পায়। তার চলাফেরা, আচার-আচরণ সবকিছুতেই তা পরিলক্ষিত হয় স্পষ্টভাবে। যেমন মজনু যখন লাইলীকে না পেয়ে অজানার উদ্দেশ্য পাড়ি জমান, এক পর্যায়ে শুধু তার জীবনে শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যতীত আর কোনোকিছুই বিদ্যমান ছিল না, তখনো সে সর্বদা শুধু লাইলী লাইলী জপতেছিল। এমন অচেতন অবস্থায়ও যদি কেউ তাকে পাশে থেকে একটু ছোঁয়া বা স্পর্শ করত সে তাৎক্ষণিক বলে উঠত কে লাইলী? ঠিক তেমনি প্রেমিক যখন একাগ্রচিত্তে তার প্রেয়সীর ধ্যানে মগ্ন থাকে,

সর্বদা প্রেয়সীকে পাওয়ার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে, হৃদয় মন তার উতলা হয়ে থাকে, তখন তার এই না পাওয়ার কষ্ট এবং বিরহের যন্ত্রণার এ দহন তার জীবনের সর্বত্র প্রজ্বলিত হতে থাকে। একথাগুলোই কবি এখানে উপস্থাপন করেছেন আপন মাধুরী মিশিয়ে। যা কবিকে বিশ্বসাহিত্য দরবারে এত উঁচু অবস্থানে নিয়ে আসতে সহযোগিতা করেছে। প্রেম সম্পর্কে কবি আরও বলেন–

هركرا جامه ز عشق چاک شد او ز حرص و عیب کلی پاک شد.[২০]

'এশকের দ্বারা যাহার জামা ছিন্ন হয়ে গেছে,
সে লোভ ও দোষ-ত্রুটি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেছে।'

প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন কারো প্রেমে পড়ে তখন দুনিয়ার সবকিছুই তার প্রেমাস্পদের সামনে তুচ্ছ মনে হয় আর এটাই স্বাভাবিক। ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট ও লোভ-লালসায় পরিপূর্ণ এই পৃথিবীতে শুধু প্রেমের জন্যই পারে একজন মানুষ এ জগৎ-সংসার ছেড়ে দিতে, আর কোনোকিছুর বিনিময়েই সে পৃথিবীর এত সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসকে বিসর্জন দিতে পারে না। প্রকৃত প্রেম মানুষকে খাঁটি মানুষ হতে শেখায়। যখন একজন মানুষ প্রকৃতপক্ষে কাউকে গভীরভাবে ভালোবাসবে, তখন পৃথিবীর সকল বিষয় থেকে তার নিকট তার প্রেমাস্পদ উর্ধ্বে থাকবে। সর্বদা প্রেমাস্পদের ধ্যানে মগ্ন থাকবে। ক্ষণস্থায়ী এ পৃথিবীর কোনোকিছুই তাকে আকর্ষণ করবে না। আনন্দময় এ জগতের কোনো আনন্দই তার নিকট তার প্রেমাস্পদ থেকে বেশি গুরুত্ব পাবে না। যেদিকে তাকাবে সবকিছুর মাঝেই শুধু তার প্রেমাস্পদকেই দেখতে পাবে। যারা নিজেকে প্রকৃত প্রেমিক হিসেবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, দেখা গেছে যুগে যুগে এমন সকল প্রেমিক দুনিয়াবি সকল চাওয়া-পাওয়া থেকে বিরত থেকেছে। প্রেমাস্পদের নেশায় থেকেছে উন্মাদ। যখন কোনো মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান খেয়াল সবকিছুতেই শুধু তার প্রেমাস্পদ, ঘুমন্ত-জাগ্রত সর্বাবস্থায় শুধু তাকেই বুকের ভেতর লালন করে, তার জন্যই অস্থির চিত্তে দিনাতিপাত করে, তখন এ জাঁকজমকপূর্ণ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর কোনোকিছুই তাকে আর আকর্ষণ করে না। এজন্যই তিনি সকল দোষ ও লোভ হতে মুক্ত। যার কোনো চাওয়া-পাওয়াই নেই তার আর কি দোষই বা থাকবে। প্রেমের জন্য যার জীবন উৎসর্গ করেছেন, নিজেকে প্রেমাস্পদের নিকট সমর্পণ করে দেহ, আত্মা সবই তার জন্য উৎসর্গ করেছে, তাকে দুনিয়ার কোনো লোভ-লালসা বা দোষ-ত্রুটি স্পর্শ করতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক। আর এটাই হলো একজন প্রকৃত আশেক তথা প্রেমিকের মূল চিত্র। একথাগুলোই এখানে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন কবি রূমী। কবি আরও বলেন–

شاد باش ای عشق خوش سود ای ما ای طبیب جمله علتهائی ما.[২১]

'তোমার মঙ্গল হউক হে এশক! তুমি আমাদের উত্তম ধ্যান ও ধারণা,
তুমি আমাদের সকল (চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক) রোগের চিকিৎসক।'

উপরোক্ত বেইতে কবি জালালুদ্দিন রূমী এশক তথা প্রেমের কল্যাণ কামনা করেছেন এবং প্রশংসা করেছেন। কবির দৃষ্টিতে প্রেম মানবজীবনের জন্য এমন এক কল্যাণকর উপাদান যা যদি কেউ নিবিড় চিত্তে নিজের মাঝে ধারণ করে তবে সে দুনিয়ার সকল প্রকার খারাপ চিন্তাচেতনা থেকে মুক্ত থাকবে। মানুষ মানবিক কিছু দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। ইচ্ছে করলেই সে নিজেকে এ সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখতে পারে না। নিজের অজান্তেই কোনো না কোনো খারাপ ধারণা তার মাঝে কাজ করতে থাকে। এই

সকল খারাপ চিন্তাচেতনা ও দোষ-ত্রুটি থেকে তাকে একমাত্র প্রেমই মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। কারণ যখন সে তার প্রেমাস্পদের ধ্যানে মগ্ন থাকবে, দুনিয়ার অন্য কোনো চিন্তাই আর তার মাথায় বাসা বাঁধতে পারবে না। সারক্ষণ শুধু প্রেয়সীকে নিয়েই সে ভাববে আর তাকে নিয়ে রঙিন স্বপ্ন দেখবে এবং তাকে নিয়ে ভাবতে ও স্বপ্ন দেখতেই তার ভালো লাগবে। এজন্যই প্রেমাস্পদের ধ্যানকে উপেক্ষা করে জগতের কোনো বিষয়ে খারাপ চিন্তা করা কিংবা খারাপ ধারণা পোষণ করা একজন প্রকৃত প্রেমিকের দ্বারা কখনো সম্ভব নয়। আর এ শিক্ষা প্রেম কখনো মানুষকে দেয় না। প্রেম মানুষকে শিক্ষা দেয় নিজেকে একজন প্রকৃত প্রেমাস্পদের রঙ্গে রঙিন করে উত্তম চরিত্রবান হতে এবং চলমান এ সমাজের যাবতীয় কুধারণা থেকে মুক্ত থাকতে। এজন্যই প্রেম হচ্ছে সকল চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক রোগের ঔষধ। একমাত্র প্রেমের মতো এ টনিকই পারে একজন মানুষকে চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সফলতার স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে দিতে। কবি একথাগুলোকেই এখানে অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। কবি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন–

جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوہ در رقص آمد و چالاک شد.[২২]

'এশকের বদৌলতে মাটির দেহ আসমানের ওপর আরোহণ করল, পাহাড় আনন্দে মত্ত হয়ে নাচতে লাগল।'

প্রেমের শক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয় না পৃথিবীতে এমন কোনো কাজই নেই। মানুষ যুগে যুগে অসাধ্যকে সাধন করেছে এ প্রেমের মাধ্যমেই। মাটি থেকে মানুষ সপ্তমাকাশে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছেন শুধুই এ প্রেমের মাধ্যমে। এখানে এ প্রেম দ্বারা মূলত আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর মেরাজে গমন করে মহান আল্লাহর সাথে যে দিদার হয়েছে সে কথাকেই বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ ও মুহাম্মদ (স.) এর মাঝে যদি এই গভীর প্রেমের সম্পর্ক না থাকত, তবে পৃথিবীর কোনো শক্তির মাধ্যমেই এ কাজ হাসিল করা সম্ভবপর ছিল না। শুধু প্রেমের শক্তির মাধ্যমেই এত বড় অসাধ্যকে সাধন করা সম্ভব, যা করে দেখিয়ে দিয়েছেন মহান আল্লাহ। একথাই এখানে কাব্যাকারে উপস্থাপন করেছেন কবি। হযজত মুসা (আ.) এর মহান আল্লাহর সাথে দিদারও এই এশকের বদৌলতেই হয়েছিল। মুসা (আ.) আশেক হয়ে হয়ে যখন মাশুকের সাথে দিদারের আশা পোষণ করলেন, মহান আল্লাহ তাঁকে বললেন ভূ-পৃষ্ঠে থাকাবস্থায় চর্মচক্ষে আমাকে অবলোকন করা সম্ভব নয়। এটি প্রমাণ করার জন্য মহান আল্লাহ মুসা (আ.) কে বললেন, তুর পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে, তবে আমার দিদার লাভ করতে পারবে। মুসা (আ.) এশক ও মহব্বতের সাথে ওই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। পাহাড়ে মহান আল্লাহর নুরের তাজাল্লি প্রতিফলিত হওয়ায় পাহাড় আলোড়িত হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। আর মুসা (আ.) মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। এইযে অলৌকিক ঘটনা এর একটি হলো মাশুক হওয়ার প্রতিক্রিয়া অপরটি হলো আশেক হওয়ার প্রতিক্রিয়া। আশেক-মাশুকের এ চমৎকার কাহিনি কাব্যাকারে উপস্থাপন করেছেন কবি রূমী অত্যন্ত চমৎকারভাবে।

কবি আরও বলেন–

با لب دم ساز خود گر جفتمی همچو نی من گفتنیها گفتمی.[২৩]

'আহা! আমি যদি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ওষ্ঠের সাথে মিলিত হতে পারতাম, তবে বাঁশির ন্যায় আমিও বহু বলার কথা বলতাম।'

মানুষ তার প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য কত ধরনের উদাহরণই না উপস্থাপন করে থাকে। বাঁশি যেমন তার বাদকের ঠোঁটের সাথে মিশে গিয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে ইচ্ছামতো গান পরিবেশন করে, প্রেমিকও চায় ঠিক তেমনি তার ঠোঁটটি প্রেমাস্পদের ঠোঁটের সাথে মিলিয়ে মনঃপ্রাণ উজাড় করে ভালোবাসার আদান-প্রদান করতে। প্রেমিকের সারাজীবনের একটি কষ্ট হলো, বাঁশি যদি তার প্রেমাস্পদের ঠোঁটের সাথে ঠোঁট মিলিয়ে মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে, তবে আমি কেন পারব না। আমারও মনে চরম ব্যাকুলতা সারাক্ষণ দোলা দিয়ে যায়, কখন পাব প্রেয়সীকে, কখন পাব তার ঠোঁটের স্পর্শ আর নিজেকে উজাড় করে দিয়ে ডুবে রব প্রেমাস্পদের বুকের সেই গভীর প্রেম সাগরে। প্রেমাস্পদকে পাওয়ার এইযে আকুলতা একথাগুলোই অত্যন্ত জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন কবি রূমী আলোচ্য কবিতায়। প্রেম সম্পর্কে কবি আরও বলেন–

هرکه او از همزبانی شد جدا بی نوا شد گرچه دارد صد نوا.[২৪]

'যে ব্যক্তি স্বীয় কথার সাথি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, সে অফুরন্ত উপকরণের অধিকারী হলেও একেবারেই নিঃসম্বল হয়ে গেছে।'

প্রেম হলো মানবজীবনের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। প্রেমহীন জীবন শুষ্ক মরুভূমির ন্যায়। শত চেষ্টা করেও যেমনি মরুভূমিতে ফুল ফুটানো যায় না, ঠিক তেমনি প্রেমহীন জীবনে কখনো সুখ ও শান্তির বাতাস বহে না। যার জীবন থেকে তার প্রেমাস্পদ বিদায় নিয়েছে, ইচ্ছে করলেই আর মনের অব্যক্ত কথাগুলোকে মনের আনন্দে প্রেয়সীর নিকট উপস্থাপন করতে পারে না। তার যতই অর্থ-সম্পদ, টাকা-পয়সা থাকুক না কেন সে মূলত নিঃস্ব। অনেক কিছু থেকেও সে আজ অসহায়ের মতো একাকী প্রেমাস্পদের স্পর্শহীন জীবনাতিবাহিত করেন। একজন মানুষের জীবনে এর চেয়ে কষ্টের আর কিছু থাকতে পারে না। অনেক বড় অট্টালিকার মালিক, পাইক পেয়াদায় বাড়িঘর পরিপূর্ণ, কিন্তু তার প্রেমাস্পদ তার কাছে নেই। হাজারো সম্পদের মাঝে বসবাস করেও মন খুলে একটু কথা বলার মানুষটা তার নিকটে বিদ্যমান নেই। কবির ভাষায় তিনি হলেন এ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নিঃস্ব। একথাগুলোই চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন মওলানা জালালুদ্দিন রূমী যা তাঁর তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। কবি আরও বলেন–

چون نباشد عشق را پروای او او چو مرغی ماند بی پروائی او.[২৫]

'মাশুক যদি আশেকের প্রতি কৃপাদৃষ্টি না করেন, তবে সে পালকহীন পাখির মতো থেকে যাবে।'

সীমাহীন সুখের এক নীড়ের নাম হলো প্রেম। ইচ্ছে করলেই যে কেউ এ নীড়ের অধিবাসী হতে পারে না। জীবনে কেউ খুব সহজেই এ নীড়ের সন্ধান পেয়েছে, আবার কেউ সারাজীবন সাধনা করেও দেখা পায়নি তার কাঙ্ক্ষিত এ নীড়ের। এটাকে পাওয়ার জন্য দরকার চরম অধ্যবসায় ও মাশুকের সদয় দৃষ্টি। আশেক তার মাশুককে পাওয়ার

আশায় সারাজীবন তার চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাচ্ছে। জীবন যৌবন সবকিছু তাকে পাবার তরে বিলিয়ে দিয়েছে, তারপরও এ পৃথিবীতে এমন হাজারো আশেক রয়েছে যারা মাশুকের ভালোবাসা তো দূরের কথা কিঞ্চিৎ আভাসও পাননি। আবার অনেক আশেক রয়েছে, যারা জীবনের সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু মাশুককে পাওয়ার উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্তে আজীবন সাধনা করে তার সন্ধান পেয়েছে। মাশুকের কৃপাদৃষ্টি যদি আশেকের প্রতি না থাকে তবে সুখের এ নীড়ে অবস্থান করতে পারা বা আশ্রয় পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আর এ জীবনে যদি এত কষ্ট সাধনার পরও মাশুকের সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে এ জীবন আর জীবন থাকে না তা পরিণত হয় পালকহীন পাখির ন্যায়। পালকহীন পাখির যেমন কোনো মূল্য নেই, ইচ্ছে করলেই সে উড়তে পারে না। সাধারণ প্রাণী আর তার মাঝে যেমন কোনো পার্থক্য নেই ঠিক মাশুকহীন আশেকও তাই। একথাগুলোই এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন মওলানা রূমী।

কবি আরও বলেন–

عشق خواهد کی سخن بیرون رود آئنه ات غماز نبود چون بود.[২৬]

'এশক চায় যে এ বিষয়ের বর্ণনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক,
কিন্তু হে শ্রোতা! তোমার হৃদয়-দর্পণ স্বচ্ছ না হলে তা কীভাবে সম্ভব?'

প্রেম নিজেই চায় তার সম্পর্কিত আলোচনা জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক। মানুষ এশক তথা প্রেমের মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানুক এবং তা হৃদয়ে ধারণ করুক। কারণ প্রেমকে হৃদয়ে ধারণ ব্যতীত হৃদয়কে সংকীর্ণতার গণ্ডি থেকে বের করে নিয়ে আসা যাবে না। আর যতক্ষণ না মানুষ নিজেকে সংকীর্ণতা নামক এ নোংরা ব্যাধি থেকে বের করে না নিয়ে আসতে পারবে, ততক্ষণ তার মাঝে উদারতা সৃষ্টি হবে না। এজন্যই কবি মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, হে মানুষ তুমি সৃষ্টির সেরা জীব। সুতরাং তুমি তোমার মনের সংকীর্ণতাকে দূর করো, আর নিজেকে মহান আল্লাহর সেরা সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করো। তবেই তোমার মাঝে প্রেমের স্বর্গীয় সুধা স্থান লাভ করবে, আর তোমার আত্মা বা হৃদয় হবে কলুষমুক্ত, পবিত্র এবং তুমি নিজে তা ধারণ করে পরিণত হবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রূপায়ণে। একথাগুলোই এখানে বর্ণনা করেছেন কবি রূমী অত্যন্ত তাত্ত্বিকভাবে।

মওলানা জালালুদ্দিন রূমী তাঁর মাসনভিগুলো বিভিন্ন কাহিনি ও ঘটনাপ্রবাহকে সামনে রেখে রচনা করেছেন অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিমায়। কখনো আধ্যাত্মিকতা, কখনো দার্শনিকতা, কখনো সুন্দর কাহিনি আবার কখনো-বা রোমান্টিকতার মতো আকর্ষণীয় বিষয়াদি তিনি এতে উপস্থাপন করেছেন। এমনই একটি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান হলো বাদশাহ ও বাঁদির কাহিনি। এখানে রূমী একজন বাদশাহ কীভাবে একজন বাঁদির জন্য পাগলপারা হতে পারে এ বিষয়টি উপস্থাপন করেছে অত্যন্ত চমৎকারভাবে। যেমন বাদশাহ ও বাঁদির প্রেম-ভালোবাসার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেন–

بهر صیدی می شد او بر کوه و دشت ناگهان در دام عشق او صید گشت.[২৯]

'শিকারের উদ্দেশ্যে তিনি পাহাড়ে-ময়দানে ঘোরাফেরা করতেছিলেন,
হঠাৎ প্রেমের ফাঁদে তিনি নিজেই শিকার হয়ে পড়লেন।'

এ বেইত দুটি মওলানা জালালুদ্দিন রূমীর বাদশাহ ও বাঁদির কাহিনি থেকে নেওয়া হয়েছে। ইসলাম পূর্ব যুগে জনৈক বাদশাহ শিকারের উদ্দেশ্যে বের হন। এমন সময় রাস্তায় এক পরমাসুন্দরী বাঁদিকে দেখতে পান এবং তার প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েন। সেখান থেকে বাদশাহ অনেক অর্থের বিনিময়ে বাঁদিটিকে ক্রয় করে নিয়ে আসেন। মূলত বাদশাহ গিয়েছিলেন শিকারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু শিকার করতে গিয়ে তিনি নিজেই যখন রাস্তার ওপরে একজন সুন্দরী নারীকে দেখতে পান, তখন শিকার করার পরিবর্তে তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকেন। কোথায় তার সঙ্গীদের সাথে নিয়ে ভালো কিছু শিকার ধরবেন, সেখানে সুন্দরী রমণীর প্রেমের ফাঁদে পড়ে নিজেই শিকারে পরিণত হলেন। আসলে মানুষের মন আর আকাশের রং এটা কখন যে কোন রং ধারণ করবে এটা বুঝা বড়ই দায়। কারণ বাদশাহ গেলেন পাহাড়-মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে শিকার করতে কিন্তু শিকার না করে নিজেই একজনের প্রেমে পড়ে শিকারে পরিণত হলেন। একথাগুলোই অত্যন্ত রোমান্টিকভাবে উপস্থাপন করেছেন কবি রূমী।

কবি আরও বলেন–

هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن
گرچه تفسیر زبان روشنگر است لیک عشق بی زبان، روشنتر است.[২৮]

'প্রেমের যতই ব্যাখ্যা বর্ণনা করি, যখন নিজে প্রেমে পতিত হই তখন ওই বর্ণনায় লজ্জিত হই, মুখের বর্ণনা যদিও স্পষ্ট, কিন্তু প্রেম হলো নির্বাক অধিক সুস্পষ্ট।'

প্রেমের ব্যাখ্যায় জগৎ বিখ্যাত বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক, লেখক, গবেষক, সুফি, সাধক অনেকেই নানা ধরনের কথা বলেছেন। প্রেমের সংজ্ঞা, অবস্থা, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, প্রেমের অনুভূতি মনে জাগ্রত হলে প্রেমিকের কী অবস্থা হয়, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। প্রেম সম্পর্কে নিজের দেওয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, আর প্রেমের সুধা নিজে পান করা দুটো এক বিষয় নয়। প্রেমের ব্যাখ্যা একভাবে উপস্থাপন করে। আর নিজে যখন প্রেমে পড়ে তখন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা আর নিজের লেখা বিশ্লেষণের মাঝে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই কবি বলেন নিজের জীবনে যখন প্রেমের মতো নির্মল পবিত্র জিনিস এসে ধরা দেয়, তখন প্রেমসংক্রান্ত ইতিপূর্বে করা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেখলে লজ্জা বোধ হয়। মানুষ প্রেম সম্পর্কে যতই লিখুক কিংবা বলুক এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্পষ্ট করার চেষ্টা করুক কিন্তু প্রেম নিজেই যদিও নির্বাক তবুও আপন রূপে, আপন মহিমায় ওই ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও বর্ণনার চেয়ে অনেক স্পষ্ট। প্রেম নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান। তার সম্পর্কে বলার প্রয়োজন নেই। যে যতই এর সম্পর্ক বলুক সে নিজেই তার চেয়ে অধিক পরিচ্ছন্ন। একথাগুলোই কবি এখানে আলোকপাত করেছেন।

কবি আরও বলেন–

آتش است این بانگ نی و نیست و باد هرکه این آتش ندارد، نیست باد
آتش عشق است کاندر نی افتاد جوشش عشق است کاندر می فتاد.[২৯]

'বাঁশির এ আওয়াজ আগুন, বাতাস নয়, এ আগুন যার নেই, সে ধ্বংস হয়ে যাক, প্রেমের আগুন পতিত হয় বাঁশির মাঝে, প্রেমের স্ফুরণ পতিত হয় মদিরার মাঝে।'

মানবজীবন সুন্দর ও সুখময় করে সাজাতে প্রেমের গুরুত্ব যেমনি অপরিসীম, তেমনি আবার এর বিচ্ছেদের যন্ত্রণাও জীবনকে নিয়ে যায় এক দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে। যদিও বাঁশি তার প্রেমাস্পদের ঠোঁটের সাথে মিলে চমৎকার এক সুখকর রোমান্টিক সুরের জন্ম দেয়। প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে নিয়ে সে সুরের মূর্ছনায় ভেসে যায় সুখের এক অজানা মোহনায়, কিন্তু বাঁশির এ সুর হতে যখন সুখের পরিবর্তে বিচ্ছেদের করুণ আর্তনাদ হয়ে রেরিয়ে আসে, তখন তা পরিণত হয় অসহনীয় এক যন্ত্রণায়। বিরহ-বিচ্ছেদের এ যন্ত্রণাকে কবি তুলনা করেছেন আগুনের সাথে। আগুন যেমন ভালোমন্দ, আপন-পর বিচার না করে আপন ধর্মে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খার করে দেয়, ঠিক তেমনি বাঁশির এ সুর যখন বিচ্ছেদের করুণ আর্তনাদ হয়ে বেরিয়ে আসে, তখন তা মানুষের অন্তরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়। আবার আগুনে পুড়ে যেমন সোনা খাঁটি হয়, ঠিক তেমনি বিরহ-বিচ্ছেদের অনলে জ্বলেও মানুষের অন্তর খাঁটি হয়। যার জীবনে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা নেই, সে দুনিয়ার অর্ধেকই বুঝেনি। প্রেমের সুখ যেমন মানুষকে সুখের অনুভূতিতে ভাসিয়ে কল্পনার স্বর্গে নিয়ে যায়, ঠিক এর বিচ্ছেদের যন্ত্রণাও তেমনি মানুষকে পুড়ে অঙ্গার করে একজন পরিপূর্ণ মানুষ এবং প্রকৃত আশেকে পরিণত করে। যার মাঝে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা নেই সে কখনো প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। একথাগুলোই এখানে অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিমায় মনের মাধুরী মিশিয়ে উপস্থাপন করেছেন কবি রূমী। বাঁশি যেমন বাঁশবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাঁদে, মানবাত্মাও তেমনি তার আত্মার জগৎ হতে পৃথক হয়ে দুনিয়ার এ পরিবেশ থেকে আত্মার জগতে প্রত্যাবর্তনের জন্য কাঁদে। গতিশীল জীবনের মূলে রয়েছে প্রেম। কারণ প্রেমই জীবনের রহস্য। প্রেমের জন্যই বাঁশিতে সুর ওঠে। জীবন উৎসের মূলে পৌঁছানোর জন্য প্রেম তার বিচ্ছেদের হাহাকারে কাঁদে। কবি আরও বলেন–

عشق هایی کزین رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود.[৩০]

'যে প্রেম শুধু রং-রূপের ভিত্তিতে হয়, তা মূলত প্রেম নয়, কেননা তার পরিণাম হলো লজ্জা ও অনুতাপ।'

স্বর্গীয় এক অনুভূতির নাম হচ্ছে প্রেম। যা স্বর্গ থেকে আসে এবং স্বর্গেই চলে যায়। তাই প্রেম হওয়া উচিত পূত-পবিত্র, নির্মল এবং স্বচ্ছ যা সম্পূর্ণ মানুষের আত্মার সাথে সম্পৃক্ত। নিতান্তই মনের আবেগ অনুভূতি থেকে যে ভালোবাসার সৃষ্টি সেটাই হচ্ছে প্রকৃত প্রেম। প্রকৃত প্রেম কখনো শুধুই মানুষের রূপ সৌন্দর্যের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই কারো মাঝে যখন এ ধরনের প্রকৃত প্রেমের উদয় হবে, তখন এ প্রেম তার মাঝে থাকবে সারাজীবন আর এটা হচ্ছে চিরস্থায়ী প্রেম। পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা মানুষের হৃদয়কে মূল্যায়ন না করে শুধু তার বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে তার প্রতি তার সৌন্দর্যের মোহে আকৃষ্ট হয়। আর এই মোহ চিরদিন থাকে না। মানুষের রূপ-যৌবন যেমন চিরস্থায়ী নয়, ঠিক তদ্রূপ এই অস্থায়ী রূপ-যৌবন দেখে যারা প্রেমে পড়ে তাদের

প্রেমও হয় ক্ষণস্থায়ী। যেহেতু তাদের মূল লক্ষ্য থাকে বাহ্যিক সৌন্দর্য, সেহেতু সৌন্দর্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাদের মধ্য থেকে বিদূরিত হয় সকল প্রকার প্রেম-ভালোবাসা। মাঝখান থেকে এই অল্প কিছুদিনের মোহে তারা স্বীকার হয় একে অপরের লালসার। হারিয়ে ফেলে মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তাদের চরিত্র ও সতীত্ব, আর তা এমন সম্পদ যা একবার হারালে আর কখনো ফিরে পাওয়া যায় না। অস্থায়ী এই সৌন্দর্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে যখন স্বাভাবিক জীবনে পদার্পণ করে তখন তার জীবনে শুধু লজ্জা আর অনুতাপ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাইতো কবি বলেছেন, বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য দেখে কেউ কাউকে ভালোবেসো না; বরং মনের সৌন্দর্য দেখে মনের সাথে যদি মনের মিল হয় তবেই তার সাথে তৈরি করো হৃদয়ের সম্পর্ক। প্রকৃত এ সম্পর্কের মাধ্যমে প্রেমিক প্রেমিকা পাবে লজ্জা, অনুতাপ ও কলঙ্কমুক্ত চিরস্থায়ী প্রেমের এক নীড় আর প্রেম হবে চিরস্থায়ী, চিরবিজয়ী। একথাগুলোই মূলত কবি এখানে বর্ণনা করেছেন। কবি আরও বলেন–

از محبت تلخها شیرین شود　　از محبت مسها زرین شود
از محبت دردها صافی شود　　از محبت دردها شافی شود.[৩১]

'প্রেম-ভালোবাসায় তিক্ততাও মিষ্টি হয়ে যায়, ভালোবাসায় পিতল স্বর্ণ হয়ে যায়,
প্রেম-ভালোবাসায় কুৎসিত বস্তুও পরিষ্কার দেখায়, ভালোবাসায় কষ্টকেও সুখ মনে হয়।'

ভালোবাসা এমন এক আজব জিনিসের নাম, যার দ্বারা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন এবং অসাধ্য বিষয়টিকেও জয় করা যায়। শুধু ভালোবাসার বিনিময়েই একজন কঠোর হৃদয়ের মানুষকেও নরম ও সহজ করা যায়। অসম্ভবকে সম্ভব, অসাধ্যকে সাধ্য করাই হচ্ছে ভালোবাসার কাজ। যদি কারো সাথে কারো খুব তিক্ততার সম্পর্ক বিরাজমান থাকে তবে এ সম্পর্ক দিনে দিনে শুধু তিক্ততার দিকেই যেতে থাকবে। এদের মাঝে যদি কেউ মনে করে যে না, পার্থিব এই জগতে কয়দিনই বা বেঁচে থাকব তার সাথে কেন আমার এ তিক্ততা থাকবে, এ চিন্তা মাথায় রেখে সে যদি তার প্রতি বিনয় ও নম্রতার হাত বাড়িয়ে দেয়, তবে তাদের এ তিক্ততার সম্পর্ক যে কি পরিমাণ মিষ্টিতে রূপান্তরিত হবে এটা কেউ ধারণাই করতে পারবে না। সম্পর্কের এই যে উন্নতি এটা শুধু ভালোবাসার দ্বারাই সম্ভব। পৃথিবীর আর কোনো শক্তিই এর চেয়ে বেশি কার্যকরী নয়। এখানে কবি আরও বলেছেন, সমাজে অনেক খারাপ প্রকৃতির মানুষ পরিলক্ষিত হয়, তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ দেখে মনে হয় এদের চেয়ে নিকৃষ্ট এবং ভয়ংকর মানুষ আর জগতে নেই। এরা কখনো হয়তো আর কোনোদিন সঠিক পথের দিশা পাবে না। অনেক ভয়ভীতি দেখিয়েও তাদেরকে ভালো করা যায় না। সেই মানুষটিকেই যদি ভয়ভীতির পরিবর্তে তার প্রতি ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়, ভয়ংকর সেই মানুষটিই দেখা যাবে একজন সোনার মানুষে পরিণত হয়েছে। এইযে পরিবর্তন এটা শুধু ভালোবাসা দ্বারাই সম্ভব অন্য কোনোকিছুর দ্বারা সম্ভব নয়। এটা দ্বারা মূলত কবি পিতলকে স্বর্ণে রূপান্তর বুঝিয়েছেন। আবার অনেক মানুষের জীবনে দেখা যায় জীবনসঙ্গী হিসেবে তারা যাদেরকে বেছে নিয়েছেন বাহ্যিকভাবে তারা অত সুন্দর নয়। কিন্তু পারিবারিক জীবনে

তারা এত বেশি সুখী যে তা ধারণাতীত। এই যে পারিবারিক বন্ধন, সুসম্পর্ক এটা শুধু নির্মল ভালোবাসার জন্যই সম্ভব হয়েছে। তাদের নিকট বাহ্যিক সৌন্দর্যটা মুখ্য বিষয় নয়; বরং মনের সৌন্দর্যটাই আসল। যেমন মজনু যখন লাইলীর প্রেমে পাগলপ্রায় তখন জনৈক ব্যক্তি মজনুকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, তোমার কী হয়েছে যে এমন কুৎসিত একটি মেয়ের জন্য তুমি পাগল হয়ে গিয়েছো। জবাবে মজনু ওই ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, আমার চোখ তোমার চোখে লাগিয়ে দেখো লাইলী কেমন সুন্দরী। এই অসুন্দর জিনিসকেও সুন্দর মনে হওয়া এটা মূলত ভালোবাসার জন্যই হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় মানুষ একজন অপরজনের জন্য নিঃস্বার্থভাবে অমানসিক কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করে থাকে। এতে বিনিময়ে যদিও তার দৃশ্যমান কোনো লাভ নেই, তবুও এত কষ্ট উপেক্ষা করে সে এ কাজ সম্পন্ন করে থাকে। তবে এ কষ্টের মাঝে একটা লাভ তার রয়েছে তা হলো আত্মিক প্রশান্তি। আর আত্মিক এই প্রশান্তির নামই হলো প্রেম, আর এটাই ভালোবাসা। কারো প্রতি যদি কারো নিঃস্বার্থ ভালোবাসা থাকে তবেই সে তার জন্য এ ধরনের কাজ আঞ্জাম দিতে পারে। এত কষ্টের পরেও কাজটি সম্পন্ন করতে পারলে বুকের ভেতর কেমন যেন একটা সুখ সুখ অনুভূতি কাজ করে। এই সুখানুভূতিটুকু পাওয়ার জন্যই মানুষ সারাজীবন ছুটে চলে বিরামহীনভাবে। একথাগুলোই কবি এখানে উপস্থাপনা করেছেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে। কবি আরও বলেন–

چون قلم اندر نوشتن می شتافت　　چون بعشق آمد قلم بر خود شکافت
عقل در شرحش چو خر در گل بخفت　　شرح عشق و عاشقی، هم عشق گفت.[৩২]

'কলম এতক্ষণ লেখার কাজে দ্রুত চলছিল, প্রেম প্রসঙ্গ এসে নিজেই ভেঙে গেল, প্রেমের ব্যাখ্যায় বুদ্ধি গাধার মতো কাদায় আটকে গেল, প্রেম ও প্রেমাসক্তির ব্যাখ্যা প্রেমই দিলো।'

প্রেম হলো দুর্দান্ত এক সাহসিকতার নাম। যা নিজেই একটি শক্তি তথা শক্তির আধার। তাই ইচ্ছে করলেই যে কেউ এ শক্তির সাথে মোকাবিলা করতে পারে না। এর সাথে মোকাবিলা করে সমানতালে চলতে, হতে হবে এর মতোই সাহসী, শক্তিশালী ও বেপরোয়া। তাইতো কবি বলেন, কলম এতক্ষণ নিজের গতিতে বিরামহীনভাবে তার লেখার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। কোনো ধরনের বাধাবিপত্তি তাকে আটকিয়ে রাখতে পারেনি। বলা হয়ে থাকে, কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়েও দামি। এমন দামি এবং শক্তিশালী একটা জিনিসও যা সবকিছু ভেদ করে দ্রুতগতিতে লেখার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল, যখনই অন্যান্য সকল বিষয় লেখা শেষে প্রেম প্রসঙ্গ আসল তখনই কলম তার অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করে থেমে গেল। প্রেম সম্পর্কে লেখার শক্তি, সাহস কোনোটাই আর কলমের থাকল না। তাই সে ভেঙে গেল। শুধু যে কলমই একা অপারগতা প্রকাশ করল বিষয়টি এমনটিও নয়; বরং লেখকের চলমান বুদ্ধিও প্রেম প্রসঙ্গ আসলে স্তব্ধ হয়ে যায়। কারণ প্রেম নিজেই একটা ব্যাখ্যা। এর জন্য আলাদা কোনো বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। যদিও যুগে যুগে অনেক কবি সাহিত্যিক, লেখক, গবেষক প্রেমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর একটি স্বরূপ দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন এবং বিভিন্নজনে বিভিন্নভাবে একে সংজ্ঞায়িত করে একটা সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছেন।

পাশাপাশি একথার সাথেও ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, প্রেম মূলত একটা সত্তা। তাই বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সময়ানুপাতে তার যুগোপযোগী ব্যাখ্যা সে নিজেই উপস্থাপন করেছেন। একথাগুলোই এখানে কবি উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ত তাত্ত্বিকভাবে।

উপসংহার

আসলে প্রেম নিজেই একটি সুখের উৎস। তাই মানুষ এ সুখের পেছনে ছুটতে গিয়ে প্রেমের হাতে ধরা দেয়।[৩৩] কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে সুখ নামের এ পাখিটি সবার জীবনে সমানভাবে ধরা দেয় না। তাই প্রেমের পরিণামে জীবনে সুখের পরিবর্তে অনেক সময় নেমে আসে এক বিষাদময় দুঃখ। তাই এ অদৃশ্য সুখ নামক এ প্রেমের সাথে যারা নিজেদের জড়িয়েছে, সময়ের ব্যবধানে অনেকে এর সান্নিধ্যে পৌঁছতে পেরেছে আবার অনেকে না পাওয়ার অতৃপ্ত তৃষ্ণায় বিরহ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে অনবরত। এসব কিছুরই অবতারণা করেছেন মওলানা জালালুদ্দিন রূমী তাঁর প্রেম কাব্যে। আর এজন্যই প্রেমের জগতে তিনি হয়েছেন অবিস্মরণীয়। মওলানা রূমীর কাব্যে প্রেম কেবল সাহিত্যিক অনুভূতি নয়; এটি একটি সুগভীর আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতিফলন। রূমীর প্রেম দর্শন সুফি সাধনার মূলভিত্তির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। যেখানে প্রেম মানুষের আত্মাকে জাগতিক সীমাবদ্ধতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে পরম সত্যের দিকে পরিচালিত করে। তাঁর কাব্যে প্রেম আত্মশুদ্ধি, আত্মবিসর্জন ও ঈশ্বরানুভূতির অনিবার্য মাধ্যম হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। রূমীর প্রেমভাবনা মানব ও ঐশী প্রেমের দ্বৈততাকে অতিক্রম করে এক সার্বজনীন আধ্যাত্মিক ঐক্যের ধারণা উপস্থাপন করে। বিরহ, বেদনা ও আত্মদহন রূমীর কাব্যের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হলেও এগুলোই শেষ পর্যন্ত আত্মার পূর্ণতা ও মুক্তির পথে সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়। অতএব, বলা যায় রূমীর কাব্যে প্রেম মানবজীবনের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও অস্তিত্বমূলক সংকট উত্তরণে এক চিরকালীন দার্শনিক দিশা প্রদান করে। যা সমকালীন মানবসমাজের জন্যও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সর্বোপরি বলা যায় রূমী তাঁর এই অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার মাধ্যমে মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার যে মিলন ঘটিয়েছেন তার জন্য সর্বদা কাব্যপিপাসু মানুষের হৃদয়ে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র

১ ড. মোহাম্মদ এসতেলামি (সম্পা.), *মাসনবিয়ে মাওলানা জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ বলখি*, ১ম খণ্ড (তেহরান: এত্তেশারাতে যাওয়ার, ৪র্থ সং., ১৯৯৩ খ্রি.), ভূমিকা-১৫; আলহাজ্ব সৈয়দ আহমাদুল হক, *মসনবী শরীফের কাহিনী ও মর্মবাণী* (চট্টগ্রাম: আল্লামা রূমী সোসাইটি, ২০০০ খ্রি.), ২।

২ বদিউযযামান ফোরোযানফার, *যেন্দেগিনামে-এ মাওলানা জালালুদ্দিনে মোহাম্মদ* (তেহরান: এত্তেশারাতে যাওয়ার, ৫ম সং., ১৯৯৭ খ্রি.), ৫-৬; ড. কাযেম দাযফুলিয়ান, *বাগে সাবযে 'ইশক* (তেহরান: এত্তেশারাতে তালাইয়েহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি.), ৯; ছৈয়দ আহমদুল হক, *বাংলাদেশের সুফী সাহিত্য* (চট্টগ্রাম: আল্লামা রূমী সোসাইটি, ২০০৭ খ্রি.), ১৩১।

৩ মাওলানা আব্দুল মজিদ (অনূদিত), *মসনবীয়ে রূমী* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.), ভূমিকা-৬।

৪ A. J. Arberry, *Mystical Poems of Rumi* (London: The University of Chicago, 1968), 3; কাজী আকরাম হোসেন, *মাসনবী রূমী* (কলকাতা: ইতিকথা বুক ডিপো, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, তা.বি.), পরিচিতি-২।

৫ ড. সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দিন সাজ্জাদি, *মোকাদ্দামে-ঈ বার মাবানিয়ে এরফান ওয়া তাসাউফ* (তেহরান: সাযেমানে মোতালেয়ে ওয়া তাদবিনে কুতুবে উলুমে এনসানিয়ে দানেশগাহা, ১৯৯৩ খ্রি.), ১৫২।

৬ R. A. Nicholson, *Rumi Poet and Mystic* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1950 AD), 22.

৭ Osho International Foundation, *Osho on Sufism* (New Delhi: New Age International Limited, 1996 AD), 1.

৮ জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ মওলভি, *মাসনাভিয়ে মানাভি* (তেহরান: এন্তেশারাতে হারমুস, ২০০৩ খ্রি.), ৫।

৯ *মসনবীয়ে মানবী*, ১ম খণ্ড, ৫।

১০ *প্রাগুক্ত*, ৪৩।

১১ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১১শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৫১৯

১২ ড. আবুল হোসেইন যাররিন কুব, *বাকারওয়ানে হোল্লে* (তেহরান: এন্তেশারাতে এলমি, খিয়াবানে ইনকিলাব, ১৩৭২ হি. শা.), ২৩১।

১৩ ছদরুদ্দিন কৌনিয়া: ছদরুদ্দিন কৌনিয়া ছিলেন ইসলামি দর্শন, সুফিবাদ ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের একজন প্রখ্যাত মনীষী। তিনি ১২০৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৭৪ খিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন মহান সুফি দার্শনিক মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবির সৎপুত্র ও প্রধান শিষ্য এবং ওয়াহদাতুল ওজুদ দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাকার। সেলজুক আমলে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক জগতের তিনি ছিলেন এক অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। দর্শন তাসাউফ ও কালামশাস্ত্রে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য তাঁকে মুসলিম বিশ্বে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। রূমীর জানাজার নামাজ তিনি পড়িয়েছিলেন যা রূমীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও রূমীর মর্যাদার বিশেষ নিদর্শন বহন করে। রূমী ও ছদরুদ্দিন উভয়েই কৌনিয়ার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে বিশ্বব্যাপী সুফি চিন্তাধারার কেন্দ্রে পরিণত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। দ্রষ্টব্য: Chittick, William C. *The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-ʿArabī's Metaphysics of Imagination* (Albany: SUNY Press, 1989), 5-7.

১৪ মো. নূরুল হুদা, *জালালুদ্দীন রুমীর মাসনবী ঃ জীবন-দর্শন ও অধ্যাত্মবাদ* (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, ২০০২ খ্রি.), ৫৩।

১৫ জালালুদ্দিন রূমী, *দিওয়ানে শামস তাবরিজি* (ইস্তাম্বুল: ইন্তেশারাতে মাতবা-এ আমির, ১৮৩৮ খ্রি.), গজল নং-৩৯৩।

১৬ শামস তাবরিজি: তাঁর পুরো নাম শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আলি আত-তাবরিজি। তিনি ১১৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান ইরানের তাবরিজে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন মহান সুফি সাধক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক। ১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দে কৌনিয়া নগরে শামস তাবরিজির সঙ্গে মাওলানা রূমীর ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ ঘটে। এই সাক্ষাৎ রূমীর জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। ইতিপূর্বে রূমী ছিলেন একজন প্রথাগত আলেম ও মুদাররিস; শামসের সংস্পর্শে এসে তিনি প্রেমময় সুফি কবিতে রূপান্তরিত হন। মাওলানা জালালুদ্দিন রূমীর আধ্যাত্মিক রূপান্তরের প্রধান অনুপ্রেরণা হিসেবে তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত। তিনি মূলত বাহ্যিক আচার অপেক্ষা অন্তরাত্মার বিশুদ্ধতা ও ইশক-ই-হাকিকি (ঈশ্বরপ্রেম)-এর ওপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন এবং প্রথাগত ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে গিয়ে গভীরভাবে সত্য অনুসন্ধান করেন। তাঁর

অসাধারণ সুফিবাদী দর্শনের কারণে তাসাউফের জগতে তিনি চির অম্লান হয়ে থাকবে। দ্রষ্টব্য: বদিউযযামান ফুরোযানফার, *যেন্দেগানিয়ে মাওলানা জালালুদ্দিন মুহাম্মদ* (তেহরান: এনতেশারাতে যাওয়ার, ৫ম সংস্করণ, ১৩৭৬ হি. শা.), ৩]

১৭ *মাসনবীয়ে রূমী*, ১ম খণ্ড, ৩০।

১৮ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার: কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক। খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি গ্রামে ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে এক বৈদ্য পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তাঁর পক্ষে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। মূলত কীর্তিপাশার জমিদারের অর্থানুকূল্যে তিনি জীবনাতিবাহিত করেন। তিনি ভক্তিমূলক ও বৈষ্ণব ভাবধারার কবিতা রচনার জন্য ছিলেন বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেম, ভক্তি, মানবিক আবেগ ও আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ লক্ষণীয়। সহজ-সরল, হৃদয়গ্রাহী ও সুরেলাভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর ধারাকে আধুনিক যুগে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়া তিনি মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহ্য ও আধুনিক যুগের সাহিত্যচেতনাকে সেতুবন্ধন করেছেন। ফলে তাঁর কবিতা বাংলা ভক্তিমূলক সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। দ্রষ্টব্য: *বাংলাপিডিয়া*, ১০ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৩), ৩১১।

১৯ *মাসনবীয়ে রূমী*, ১ম খণ্ড , ৩৩।

২০ *প্রাগুক্ত*, ৩৯।

২১ *প্রাগুক্ত*।

২২ *প্রাগুক্ত*, ৪০।

২৩ *প্রাগুক্ত*, ৪১।

২৪ *প্রাগুক্ত*।

২৫ *প্রাগুক্ত*, ৪৬।

২৬ *প্রাগুক্ত*, ৪৭।

২৭ *প্রাগুক্ত*, ৫০।

২৮ ড. মোহাম্মদ এসতেলামি (সম্পাদিত), *মাসনাভিয়ে মাওলানা জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ বালখি*, ১ম খণ্ড, বেইত নং-১১২-১১৩, (তেহরান: এন্তেশারাতে জাওয়ার, ১৩৭২ হি.শা.), ১৪।

২৯ *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, বেইত নং-৯-১০, ৯।

৩০ *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড , বেইত নং-২০৬, ১৮।

৩১ *মাসনবীয়ে মানবী*, ১ম খণ্ড, বেইত নং-১৫৩০-১৫৩১, ৩৭২।

৩২ মাসনবীয়ে মাওলানা জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ বালখী, ১ম খণ্ড, বেইত নং-১১৪-১১৫, ১৪।

৩৩ *মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনাবলী*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রি.), ২৭৭।